জীবনে যা দেখলাম

ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৮৪-১৯৯৩)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়া ১৭
আবার যুগপৎ আন্দোলন ১৭
১৯৮৫ সালে এরশাদের নব উদ্যম ১৮
এরশাদের আমেরিকা সফর ১৮
এরশাদের একটি বিরাট সাফল্য ১৯
এরশাদ আমলে বারবার রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয় ২০
দেশকে সংসদ নির্বাচনমুখী করার সরকারি উদ্যোগ ২০
যুগপৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচন ২১
জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি ২২
নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের মনোভাব ২০
এক আজব রাজনৈতিক পরিবেশ ২৩
ধমকে কাজ হলো ২৪
বিএনপির টেকনিক্যাল কারণটি কী? ২৫
তৃতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের সিদ্ধান্ত ২৬
৭ মে তারিখের সংসদ নির্বাচন ২৬
প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা ২৭
দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের গুরুত্ব ২৭
৭ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ২৮
নির্বাচনী ফলাফলের মূল্যায়ন ২৯
জামায়াতের নির্বাচনী ফলাফল ২৯
কারচুপির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৩০
আমার নাগরিকত্ববিহীন অবস্থান ৩১
নাগরিকত্ববিহীন অবস্থায় সাংগঠনিক দায়িত ৩২
সাংগঠনিক সফর শুরু করলাম ৩২
আমার সাংগঠনিক সফরে এরশাদ সরকারের আপত্তি ৩৩
আমার নাগরিকত্ব সমস্যা ৩৪
৮৬ সালের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা ৩৫
আবার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ৩৫
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ৩৬
১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৩৭
নির্বাচনী ফলাফল ৩৭
নির্বাচনের পর ৩৭

নির্বাচনী সমঝোতা প্রচেষ্টা ২২৩
নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২২৩
১৯৯১ সালের নির্বাচন পলিসি ২২৪
নির্বাচন পলিসি সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ২২৪
পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী পরিবেশ ২২৫
জামায়াতের নির্বাচনী অভিযান ২২৫
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২২৬
আমার চেম্বারে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর আগমন ২২৭
সরকার গঠনপ্রক্রিয়া ২২৮
বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব ২২৯
জামায়াতের হিসাব আলাদা ২২৯
২০০১ সালে জামায়াত সরকারে শরীক কেন? ২৩০
বেগম খালেদা জিয়া সহযোগিতা চাইলেন ২৩১
প্রেসিডেন্টের সাথে জামায়াতনেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ২৩৩
বিএনপির পক্ষ থেকে চিঠি এল ২৩৪
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ২৩৪
জামায়াতের সম্মতিসূচক চিঠি নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ ২৩৫
সরকার গঠনে জামায়াতের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ২৩৬
জামায়াতে ইসলামী মনোনীত নির্বাচিত এমপিগণ ২৩৭
জামায়াতের মহিলা এমপি ২৩৯
পর্দার প্রশ্ন ২৩৯
পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশন ২৪০
সরকারপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য ২৪০
সরকারপদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও তার সমাধান ২৪১
একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস ২৪২
গণতন্ত্রের শুভ সূচনা ২৪২
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জুলাই (১৯৯১) মাসের অধিবেশন ২৪৩
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর হামলা ২৪৩
আমার নাগরিকত্ব ইস্যু ২৪৪
আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা ২৪৫
আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ২৪৫
১৫ সেপ্টেম্বরের গণভোট ২৪৬
৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২৪৭
সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ২৪৮

২১৯.

সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়া

১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনের সাথে সরকারের সংলাপ ১৯৮৪ সালের ২৯ এপ্রিল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিক কারণেই এরশাদবিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় এবং জেনারেল এরশাদ দাপট দেখানোর সুযোগ পেয়ে যান। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হওয়ার ফলেই তো সামরিক শাসনকর্তা উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং আন্দোলনরত জোট ও দলের সাথে সংলাপের প্রয়োজন বোধ করেন।

সংলাপের সময় জেনারেল এরশাদ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে সামরিক শাসনকে আবার মযবুত করতে সক্ষম হন।

একটি আন্দোলন জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেও আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার ফলে যদি আন্দোলন থেমে যায় তাহলে নতুন করে আবার আন্দোলনকে চাঙ্গা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সরকার পূর্বের চেয়েও বেশি মযবুত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরশাদ চেয়েছিলেন প্রথমে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করে তার গণভিত্তি রচনা করতে। সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে লাগলেন। উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেও কয়েকবার পরিবর্তন করেন। ১২ জুলাই ঘোষণা করেন, ৮ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অক্টোবরে আবার তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালে কোনো নির্বাচনই হয়নি।

আবার যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৪ সালেই জুলাই পর্যন্ত আন্দোলন স্তিমিত থাকার পর আগস্টে আবার কর্মসূচি শুরু করা হয়। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির অব্যাহত যোগাযোগের ফলে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের ডাকে ২৭ আগস্ট সারা দেশে হরতাল পালনের মাধ্যমে আন্দালনের সূচনা করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর আবার হরতাল ডেকে আন্দোলনকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা চলে। ১৪ অক্টোবর ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াত পৃথকভাবে ঢাকায় মহাসমাবেশ করে। তাতেও আন্দোলনে তেমন গতি সঞ্চার হয়নি।

৮ ডিসেম্বর সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালনের পর আবার ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর একটানা দুই দিনের হরতাল ডাকা হলে সরকার ২০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ সত্ত্বেও হরতাল পালন করা হয়।

এভাবেই ১৯৮৪ সাল অতিক্রান্ত হয়। আন্দোলন চলতে থাকে, কিন্তু সরকার মোটেই বিব্রতবোধ করেনি।

১৯৮৫ সালে এরশাদের নব উদ্যম

১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এরশাদ মন্ত্রিসভা বাতিল করে পরদিন সাত সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১ মার্চ এরশাদ তার প্রতি জনগণের আস্থাসূচক রায় হাসিল করার উদ্দেশ্যে ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এটা স্বৈরশাসকদের একটা বিশ্বজনীন কৌশল। গণভোটে জনগণকে সরকারের পক্ষে 'হ্যাঁ ভোট' বা বিপক্ষে 'না ভোট' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জনগণ জানে যে, 'না ভোট' দিলেও স্বৈরশাসক পদত্যাগ করবেন না। তাই এ প্রহসনমূলক ভোটে জনগণের কোনো আগ্রহ থাকে না। সরকারি প্রচেষ্টায় কিছু লোককে হ্যাঁ-বোধক ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে হাজির করা হয়। যারা হ্যাঁ-বোধক ভোট দিতে চায় না, তারা কেন্দ্রে যায়-ই না। এভাবে জনগণের আস্থাভোট লাভের একটি রীতি সকল স্বৈরশাসকই অনুসরণ করে থাকেন। গণভোটকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১ মার্চ থেকেই রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়।

৯ এপ্রিল ('৮৫ সাল) সরকার ঘোষণা করে, ১৬ ও ২০ মে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের যে দাবি যুগপৎ আন্দোলনের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, এ ঘোষণা ঐ দাবির সুস্পষ্ট বিরোধী হওয়ায় আন্দোলনের পক্ষ থেকে এ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। '৮৪ সালের মার্চ মাসে উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করায় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এরশাদের সাথে সংলাপে যেতে সম্মত হন। কিন্তু সংলাপে নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা টের পেয়ে যখন উপজেলা নির্বাচন ঘোষণা করা হলো, তখন তা ঠেকানোর কোনো সাধ্যই রইল না।

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি গ্রহণে ব্যর্থ হলো। ফলে দুই জোটের দলীয় লোকদের পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো না। অবশ্য জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন হরতাল দিয়ে যুগপৎ আন্দোলনকারীরা দায়সারাভাবে নির্বাচনবিরোধী ভূমিকা পালন করে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।

এরশাদের আমেরিকা সফর

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র (খওই) বর্তমানে নিজেদেরকে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা মনে করে এবং যেসব দেশ এ নেতৃত্ব মেনে নেয় সেসব দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান আমেরিকার কূটনৈতিক স্বীকৃতি হাসিল করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরে যান এবং ২১ অক্টোবর ফিরে আসেন। ঐ বছর মার্চ মাসে তিনি হ্যাঁ-ভোটে জনগণের আস্থা হাসিল করায় আমেরিকায় কোনো মর্যাদা পেয়েছিলেন কি না জানি না। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন সত্ত্বেও ক্ষমতায়

টিকে থাকার প্রমাণ অবশ্য দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা না হলে সেখানে যাওয়ার সুযোগই পেতেন না।

ঐ সফরে তিনি বাংলাদেশের জন্য কী কী সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাও আমার সঠিক জানা নেই। তবে সেখান থেকে দুটো শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, যা তিনি এ দেশে প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ করলেন:

১. ইসলামী আন্দোলনকে 'মৌলবাদ' নামক গালি দেওয়ার মৌলিক শিক্ষা। আমার অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, এ দেশে এ 'মহান' গালিটি এর পূর্বে চালু ছিল না। শব্দটির অর্থ যা-ই হোক, যারা এটাকে ব্যবহার করেন তারা নিন্দাবাচক শব্দ হিসেবেই তা উচ্চারণ করেন।

২. আমেরিকার রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের স্ত্রীর জন্য 'ফার্স্ট লেডি' নামে একটা সরকারি পদবি রয়েছে। তিনি ঐ পদবিটি তাঁর স্ত্রী রওশন এরশাদকে দান করেন। এমনকি বঙ্গভবনে ফার্স্ট লেডির সরকারি অফিস পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ পদত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ঐ পদবির সকল সুবিধা ভোগ করেন।

এরশাদের একটি বিরাট সাফল্য

এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের গৌরবজনক অধ্যায় রচিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ থেকে তিন দিনব্যাপী এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্ক (ওইঈঊ৷ ওমর্লদ ত্র্বধটভ ত্র্মডধর্টধমভ তমর ৗণথধমভটফ উম-মযণরর্টধমভ) নামক সংগঠনটি জন্মলাভ করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপমহাদেশের সাতটি রাষ্ট্রের একটি সংস্থা কায়েমের উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ শুরু করলেন; সাড়াও পেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেলেন না। ১৯৮১ সালে তিনি নিহত না হলে হয়তো তাঁর সময়ই সংস্থাটি জন্মলাভ করত। ঢাকায় সার্কের শুভযাত্রা শুরু হওয়ায় জিয়ার স্বপ্ন তাঁর জন্মভূমিতেই পূরণ হলো।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ– এ সাতটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেশ সংস্থাভুক্ত হয়। সার্কের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব পাস হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা বাস্তাবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রই উপকৃত হতো। যদি তা সফল করার জন্য সবাই সম্মত হতো তাহলে সার্কের উদ্দেশ্য অবশ্য পূরণ হতো। যেহেতু সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতই সর্ববৃহৎ, সেহেতু এর সহযোগিতার অভাবেই এ সংস্থাটি এগোতে পারছে না।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে সার্কের শীর্ষ সম্মেলনের মহা-আয়োজন খোঁড়া অজুহাতে ভারত বানচাল করে দেয়। সার্কের জন্ম ঢাকায়– এটা সত্যিই গৌরবের বিষয়। এ গৌরব অর্জনে জেনারেল এরশাদের সাফল্য অনস্বীকার্য। তবে সার্কের সাফল্য ভারতের সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এরশাদ আমলে বারবার রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয়

এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কয়েকবারই রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপারে এরশাদের কৌশল ছিল নিম্নরূপ:

তিনি যা করতে চাইতেন, তা সম্পাদন করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ঘোষণা করতেন। কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেও ময়দানে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে কিছু দিন রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়া পর্যায়ে রাজনীতি করার অনুমতি দিতেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও দুর্বলতা থাকার কারণেই তিনি এ কৌশল প্রয়োগ করেন। যদি রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার ঘোষণাকে উপেক্ষা করার সাহস রাজনৈতিক দলগুলো প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো তাহলে রাজনীতি নিয়ে এ জাতীয় খেল-তামাশা করার হিম্মত তিনি পেতেন না।

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ হ্যাঁ-নাবোধক গণভোটকে সফল করার উদ্দেশ্যে ১ মার্চ তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন, ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু করা যাবে।

১০ ডিসেম্বর সার্ক সম্মেলন সফলভাবে সমাধা হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেন।

দেশকে সংসদ নির্বাচনমুখী করার সরকারি উদ্যোগ

১৯৮৫ সালের মার্চে গণভোট ও মে মাসে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ডিসেম্বরে সাফল্যের সাথে সার্ক সম্মেলন সম্পন্ন করার পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতার মসনদে মযবুত অবস্থান হাসিল করেছেন বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো তো সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি ১৯৮৩ সাল থেকেই জানিয়ে এসেছে। যদিও তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে, তবু সংসদ নির্বাচনে তাদের আপত্তি না হওয়ারই কথা। এ বিবেচনা অনুযায়ী এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমুখী করার কৌশল অবলম্বন করলেন। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে, যাতে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। নির্বাচনের টোপ ফেললে তাদের সরকারবিরোধী ঐক্যও ভেঙে যাওয়ার কথা।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় যদি রাজনৈতিক দলসমূহ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে সরকার আরো স্থিতিশীল হবে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য অবশ্যই বিনষ্ট হবে।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ ফেব্রুয়ারি মাসেই ঘোষণা দিলেন, ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যুগপৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচন

নির্বাচনের ঘোষণার পর ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে লিয়াজোঁ পর্যায়ে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে যোগাযোগের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

প্রাথমিক আলোচনায় এ বিষয়ই প্রাধান্য পেল যে, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে আদৌ সামান্যতম নিরপেক্ষতা ও থাকবে কি না? সবাই এ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন।

জামায়াতের পক্ষ থেকে দুই জোটকে বলা হলো, এরশাদকে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানাতে পারলে নির্বাচন বর্জন করার অজুহাত সৃষ্টি হতে পারে। আমরা এরশাদের পদত্যাগ দাবি না করলে নির্বাচন বয়কট করার পক্ষে কোনো যুক্তিই থাকে না। এরশাদকে ক্ষমতাসীন রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তাঁকে ক্ষমতায় স্থিতিশীলই করা হবে।

এরশাদের পদত্যাগ দাবি না করায় রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে রীতিমতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। পরস্পর সন্দেহ করাও শুরু হলো। জোট ও জামায়াত যখন লিয়াজোঁতে বসে তখন সবাই নির্বাচনের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করে। নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে এরশাদের গদি আরো মযবুত হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

১৫ দলীয় জোটে বাম দলগুলোও শরীক ছিল। তাদের কারণেই জোটে দলের সংখ্যা এত বেশি হয়। নির্বাচন হলে বামদের তেমন কোনো সুবিধা হবে না বলে তারা সচেতন। তাদের পক্ষ থেকে একটা চাল ময়দানে চালাতে চেষ্টা করা হয়েছে। সিপিবির সভাপতি কমরেড ফরহাদ আহমদ দাবি জানালেন, একটা প্রতীকী নির্বাচন হোক। শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে প্রত্যেকে দেড় শ' আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তারা যদি অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হন তাহলে তারাই সরকার গঠন করবেন। এরশাদের দল পরাজিত হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

ভাবসাবে মনে হলো দুই নেত্রীই এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এরশাদ আতঙ্কিত হয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করলেন, কোনো প্রার্থী একসাথে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এভাবে ফরহাদ সাহেবের কূটচাল বানচাল হয়ে গেল।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কেউ উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। গণ-আন্দোলন করে এরশাদকে অপসারণ করার মতো পরিস্থিতি যুগপৎ আন্দোলন দ্বারা সৃষ্টি না হওয়ায় সবাই অনুভব করছিলেন যে, এ নির্বাচন ঠেকানো যাবে না। কিন্তু আন্দোলনরত জোট ও দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় এবং নির্বাচনবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকায় রাজনৈতিক পরিবেশ সন্দেহযুক্ত হয়েই রইল।

এ পরিস্থিতিতে কমরেড ফরহাদের প্রস্তাব প্রধান দুই দল বিবেচনাযোগ্য মনে করায় স্বাভাবিক কারণেই জামায়াত অত্যন্ত বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হয়। যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াতের অগ্রগতিতে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই কমরেড

ফরহাদ এমন এক প্রস্তাব পেশ করলেন, যাতে জামায়াত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই না পায়। এরশাদ এ প্রস্তাব সমর্থন না করায় ঐ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামায়াতের সাথে বিএনপির নির্বাচনী সমঝোতার প্রয়োজন উভয় দলই অনুভব করল। এ উদ্দেশ্যে বিএনপির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমার প্রাথমিক আলোচনা হয়। আমি বেগম সাহেবার নিকট প্রস্তাব রাখলাম, বিএনপি ২০০ আসনে প্রার্থী দিক এবং জামায়াতকে ১০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিক। বেগম সাহেবা বললেন, কতক ছোট ছোট দলের জন্যও কিছু আসন রাখতে হবে। আমি বললাম, ১৫/২০ আসন রেখে ৮০টি জামায়াতকে ছেড়ে দিন। তিনি বললেন, বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকারে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি

কেয়ারটেকার ফর্মুলা দুই জোট গ্রহণ না করায় নির্বাচন বর্জনের পক্ষে আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে জামায়াতের মনে হয়নি। এরশাদ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে বলে দাবি করাই আন্দোলনের প্রধান বিষয় হওয়া উচিত ছিল। এটাই জনগণের নিকট একমাত্র বোধগম্য ইস্যু হতে পারত। কিন্তু পদত্যাগের পরে ক্ষমতা কার হাতে যাবে, এর কোনো প্রস্তাবনা কারো কাছেই ছিল না। কেয়ারটেকার ফর্মুলাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ দাবি হতে পারত।

রাজনৈতিক ময়দানে কোনো দলের পক্ষ থেকে পেশ করা বড় ধরনের কোনো ইস্যুকে সমর্থন করা বড় দলগুলোর জন্য অত্যন্ত কঠিন। এতে ঐ ইস্যুর প্রবক্তার মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয় বলে বড় দল এটাকে দলীয় প্রেস্টিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে থাকে। জামায়াতকে ঐ মর্যাদা দিতে কেউ রাজি হলেন না; অথচ তাদের নিকট কোনো বিকল্প প্রস্তাবও ছিল না।

দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সাথে জামায়াতের নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমেই আন্দোলনের কর্মসূচি পৃথকভাবে ঘোষণা করা হতো। দুই জোট ও জামায়াত একমঞ্চে সমবেত হতো না। দুই জোটও এক মঞ্চে কর্মসূচি পালন করত না। একমত হয়ে একই কর্মসূচি আলাদাভাবে ঘোষণা করা হতো। সাংবাদিকরা দুই জোটকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের কর্মসূচি গ্রহণের বেলায় কি জামায়াতও শরীক থাকে? জবাবে উভয় জোটই অস্বীকার করত এবং বলত, কোনো দল আমাদের কর্মসূচি অনুকরণ করলে আমরা বাধা দিই না। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই জোট জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে তখনো প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণে জামায়াত লিয়াজোঁ পর্যায়ে দুই জোটের সাথে নিয়মিত শরীক থাকা সত্ত্বেও তারা জামায়াতকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। জামায়াতের পেশ করা কেয়ারটেকার ফর্মুলা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব?

নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের মনোভাব

রাজনৈতিক ঐ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তিন দিনব্যাপী এক বৈঠক হয়। ব্যাপক আলোচনার পর জামায়াত সিদ্ধান্ত নেয় যে, যুগপৎ আন্দোলনের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকায় স্বৈরশাসককে অপসারণের কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই জনগণকে নির্বাচনমুখী করা ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচির প্রতি তেমন সাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। দুই জোটকেও নির্বাচনমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। নির্বাচনে যাতে এরশাদের দল কিছুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে না পারে, সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প কর্মসূচির সম্ভাবনা নেই।

বিশেষ করে জামায়াতের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সবচেয়ে জরুরি। কারণ, বাংলাদেশে জামায়াতের নামে তখন পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে আইনগতভাবে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কোনো দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং নির্বাচন কমিশন সে দলের জন্য প্রতীক বরাদ্দ করলে দলটি আইনগতভাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেল। যদি নির্বাচনে অন্তত ১০টি আসনে জয়ী হয়ে পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা পেয়ে যায় তাহলে জনগণের নিকটও একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। নির্বাচনে কোনো আসন না পেলেও আইনগত সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। এ মর্যাদা পেলে রাজনৈতিক ময়দানে সে দলটিকে স্বীকৃতি দিতে সবাই বাধ্য। শেষ পর্যন্ত কর্মপরিষদের সকল সদস্য একমত হলেন যে, জামায়াতের অস্তিত্বের স্বার্থেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

এত বড় ইস্যুতে কর্মপরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গঠনতান্ত্রিক ইখতিয়ার না থাকায় জামায়াতের মজলিসে শূরা আহ্বান করা হলো। মজলিসে শূরা সদস্যগণ বিষয়টির গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রাণ খুলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মজলিসে শূরায় দুই দিন বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২২০.

এক আজব রাজনৈতিক পরিবেশ

রাজনৈতিক জোটভুক্ত দলসমূহ ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, অপরদিকে প্রকাশ্যে নির্বাচনবিরোধী বক্তব্যও দিয়ে যাচ্ছিল। বড় দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকাই স্বাভাবিক। কোনো দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা না বলায় পারস্পরিক সন্দেহ বিরাজ করছিল। এ পরিবেশে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম লালদিঘি ময়দানে দলীয় জনসভায় বলেন, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অর্থহীন। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এরশাদের গদি মযবুত করবে তারা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে গণ্য হবে।

অথচ ময়দানে গুজব রটেছে যে, ১৫ দলীয় জোটের শরীক দলগুলো নির্বাচনে আসন দাবি করে রীতিমতো দর কষাকষি চালাচ্ছে।

তখন জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা চলছে। বেগম জিয়ার পক্ষ থেকে কর্নেল মুস্তাফিজ ও জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠকাদি চলল। প্রথমে বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতকে মাত্র ২০টি আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কয়েক দিনের দর কষাকষির পর কর্নেল মুস্তাফিজ ৫০টি আসন জামায়াতকে ছেড়ে দিতে সম্মত হলে শেষ পর্যন্ত জামায়াত তা মেনে নেয়।

পরে জানা গেল, জামায়াতকে এত বেশি আসন ছেড়ে দিতে সম্মত হওয়ায় নিজ দলীয় বৈঠকে কর্নেল মুস্তাফিজ রীতিমতো নাজেহাল হন। ফলে বিএনপির সাথে নির্বাচনী সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হওয়ায় জেনারেল এরশাদ ধমকের সুরে ঘোষণা করলেন, ১৯ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। ২০ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশে নির্বাচন সম্পর্কে ভাষণ দেবেন। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না তাদেরকে নির্বাচনবিরোধী কোনো তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর তিনি হয়তো জানতেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধী কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ময়দানে না থাকায় এরশাদ পূর্ণ আস্থার সাথেই ঐ সতর্কবাণী উচারণ করলেন।

ধমকে কাজ হলো

এরশাদের এ ধমকে কাজ হলো। জানা গেল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ১৯ মার্চ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসবে। জামায়াতও ঐ একই তারিখে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিল।

১৯ মার্চ (১৯৮৬) আমার সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের বৈঠক শুরু হলো। কর্মপরিষদ তো পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দুই জোটের এক জোটও যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে জামায়াত অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তাই বৈঠকে আলোচনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম তা-ই যথেষ্ট ছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলাম। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন।

আমাদের সিদ্ধান্ত পত্রিকায় পাঠানোর পূর্ণ প্রস্তুতি সত্ত্বেও ঐ দুই দলের সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য ছিলাম। রাত ১১টা পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত জানা গেল না। তাই আমি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। ঐ দুই দলের সিদ্ধান্ত জানার পর আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্রিকায় খবর দেওয়ার কথা।